বিক্রমাদিত্য।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বিক্রমাদিত্য।



শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

প্রকাশক
শ্রীহরিরাম ধর বি, এ,
পপুলার লাইব্রেরী, ঢাকা।

১৩২২ সন।

ঢাকা,
আশুতোষ প্রেস হইতে
শ্রীরেবতীমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

বিদ্যোৎসাহী,

সর্ব্ব সৎকার্য্যে অগ্রণী,

বহুগুণান্বিত, উদারহৃদয় ভূম্যধিকারী

শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী

বাহাদুরের

মহিমান্বিত নামে

বিক্রমাদিত্য

উৎসর্গ করিলাম।

অশোকাষ্টমী—
১০ই চৈত্র, বুধবার।
১৩২১ সাল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেবশর্ম্মা।

আজি এই পুণ্যভূমে পূত সন্ধিক্ষণে,
আসিয়াছি হে মহান্! পুলকিত মনে
বরিতে তোমায়,—কত সুকৃতির ফলে
ক্ষুদ্র এ কুসুমে,—সিক্ত প্রেম অশ্রুজলে!



কুমার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর।

জমিদার গোলোকপুর, ময়মনসিংহ।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা

উপহার পৃষ্ঠা।

আমার

....

শ্রী..

....কে

বিক্রমাদিত্য

সাদরে উপহার প্রদান

করিলাম।

১৩২ সাল
তারিখ

শ্রী..............................

নিবেদন

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কোনও প্রামাণিক ইতিহাস নাই। আর আমি ইতিহাস লিখিও নাই। কিম্বদন্তীর উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া, বিক্রমাদিত্যের চিত্র অঙ্কিত করিলাম। যদি শিশুগণ বিক্রমাদিত্য খানি পাঠ করে, তবেই আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব।

মসূয়া
ভারতী-কুটীর
ময়মনসিংহ
শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বন্দনা।

যা কুন্দেন্দু-তুষার-হার-ধবলা
যা শ্বেতপদ্মাসনা,
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা
যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা,
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্কর প্রভৃতিভিঃ
দেবৈঃ সদা বন্দিতা,
সা মাম্ পাতু ভগবতী সরস্বতী
নিঃশেষ জাড্যাপহা।

চিত্র-সূচী।

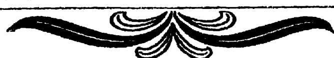
—*—



কালিদাসের রঘুবংশ রচনা

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা

বিক্রমাদিত্য



প্রস্তাবনা।

"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"
—মাইকেল।

এই সংসারে ধন দৌলত, দালানকোঠায় যে কেবল বড় লোক হওয়া যায়, এমন নহে। সেকালে কত লোকেরইত খুব টাকা পয়সা ছিল, কিন্তু আমরা তাহাদের মধ্যে কয়জনের নাম জানি? কয়জনের নাম আমরা শুনিতে পাই? এই বিশাল দেশ ভারতবর্ষে তখন বহু রাজাই রাজত্ব করিয়াছেন; তন্মধ্যে দুই

বিক্রমাদিত্য

চারিটী রাজার কথা আমরা শুনি। আর সকলেই আমার তোমার মতই ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা এমন কোনও মহৎ কার্য্যই করেন নাই, যেজন্য তাঁহাদের নাম থাকিতে পারে।

যে সকল রাজারাজরা সৎকার্য্য করিতেন, টাকা পয়সার উচিত ব্যবহার করিতেন, দেশে বিদেশে যাঁহার সৎকার্য্য গুলি প্রশংসা লাভ করিত,আমরা তেমন রাজাদিগের নামই শুনিয়া থাকি। ইহাতে বেশ বোঝা যায়, টাকা পয়সা থাকিলে বা ব্যয় করিলেই চিরদিন লোকের নিকট সুনাম পাওয়া যায় না; টাকার সদ্ব্যয় হওয়া চাই।

তবে কি টাকা পয়সা, ধন দৌলত যাহার নাই, সে এমন কিছু করিতে পারে না—যাহাতে তাহার নামটী চিরদিনই লোকে ভক্তির সহিত গ্রহণ করিবে ?—আছে বৈ কি। তোমরা

বিক্রমাদিত্য

মহাত্মা বাল্মীকির নাম শুনিয়াছ। তিনি বড় গরীবের ছেলে ছিলেন—কিন্তু এই জগতে আর কয়জন তাঁহার মত নাম করিয়াছেন?

আমরা আজ তোমাদিগকে একজন রাজা ও একজন দরিদ্রের গল্প বলিব। দুইজনই, যত দিন পৃথিবী থাকিবে, তত দিন লোকের নিকট পূজা পাইবেন। সেই দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন মহারাজ **বিক্রমাদিত্য**, দ্বিতীয় কবিকুলচূড়ামণি দরিদ্র **কালিদাস**, দুইজনই অমর হইয়া রহিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য ছিলেন বলিয়া কালিদাস জগদ্বিখ্যাত; কালিদাসের ক্ষমতার বলে বিক্রমাদিত্য জগতে পরিচিত। ধনের সার্থকতা করিয়াছিলেন বলিয়া বিক্রমাদিত্য আজিও অমর হইয়া রহিয়াছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উজ্জয়িনী।

আমাদের এই ভারতবর্ষের মত সুন্দর দেশ পৃথিবীতে আর নাই। ইহার উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতমালা, আর দক্ষিণে অনন্ত-বিস্তার মহা-সমুদ্র; মধ্যস্থলে বিন্ধ্যগিরি। বিন্ধ্যগিরি হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত স্থানকে আর্য্যাবর্ত্ত ও বিন্ধ্য-গিরির দক্ষিণবর্ত্তী সমুদয় স্থানকে দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য বলে।

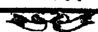
বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদমূলে মালব দেশ। মালব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। উহার একদিকে অত্যুচ্চ বিন্ধ্যপর্ব্বত, আর এক দিকে আর্য্যাবর্ত্তের বিস্তৃত সমতল ভূমি।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন এদেশে মালবের মত সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত রাজ্য,

ভারতবর্ষে আর ছিলনা বলিলেই হয়। ধন, সম্পদ ও বিদ্যালোচনায় মালব বিশেষ খ্যাতি-লাভ করিয়াছিল।

এই মালবরাজ্যের রাজধানী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী নগরী। শিপ্রা নদীর তীরে এই নগরী প্রতিষ্ঠিত। উজ্জয়িনী কেবল মালবের রাজধানী বলিয়াই বিখ্যাত নহে। ইহা হিন্দুগণের এক পরমপবিত্র তীর্থ স্থান।

দক্ষযজ্ঞে পতি-নিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিলে, ভগবান মহাদেব সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। কেহই তাঁহার নিকট হইতে সেই মৃতদেহ লইতে সাহসী হইলেন না। তখন দেবগণের পরামর্শ মত স্বয়ং শ্রীহরি সুদর্শন চক্র লইয়া, মহাদেবের পশ্চাতে গুপ্তভাবে চলিলেন এবং তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সুযোগ মত সতী-



দেহের এক এক অংশ কাটিয়া ফেলিতে লাগিলেন। যে স্থানে সতীদেহের অংশ পতিত হইয়াছে, তাহাই হিন্দুর তীর্থস্থান। উজ্জয়িনীর নিকটবর্ত্তী ভৈরব পর্ব্বতে সতীর উর্দ্ধ ওষ্ঠ পতিত হইয়াছিল।

তোমরা কুম্ভমেলার নাম শুনিয়া থাকিবে। ঐমেলাতে সমগ্র ভারতের সংসারত্যাগী সাধু সন্ন্যাসী মহাপুরুষগণের সম্মিলন হয়। লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী এই মেলায় একত্রিত হইয়া থাকেন। হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী ও নাসিক এই চারি জায়গায়ই ক্রমে তিন তিন বৎসর অন্তে কুম্ভমেলা হয়। অর্থাৎ প্রতি বারবৎসর পর এক এক স্থানে কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। এদেশের কত ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী কুম্ভমেলায় সাধুদর্শন করিতে গমন করিয়া থাকেন।

এখন তোমরা বুঝিতেছ,—হরিদ্বার, বা প্রয়াগের মত উজ্জয়িনীও এদেশে এক পবিত্র ও প্রসিদ্ধ স্থান।

উজ্জয়িনীর আর একনাম অবন্তী বা অবন্তিকা।*তোমরা হয়ত এই শ্লোকটী জাননা,—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশীকাঞ্চী অবন্তিকা,
পুরীদ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ।

উজ্জয়িনীতে মহাকাল নামে এক শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন, এজন্য এইস্থানকে মহাকালপুরীও বলে। কথিত আছে, মহাকাল শিবের কপালে মহামূল্য মণি-মণ্ডিত যে অর্দ্ধচন্দ্র আছে, তাহার প্রভায় কৃষ্ণপক্ষীয়া রজনীতেও পুরী আলোকময়ী হইয়া থাকে।

* শাস্ত্রে আছে, বিষ্ণুর মস্তক অযোধ্যা, নাসা বারাণসী, জিহ্বামূল মথুরা, হৃদয় মায়াপুরী, নাভি দ্বারাবতী, কটি এবং পাদ অবন্তী। এজন্য অবন্তীর এক নাম বিষ্ণুপাদ। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই নগরীর বিশাল শোভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ইহার নাম বিশালা রাখেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে উজ্জয়িনীতে এক অতি প্রতাপশালী রাজা রাজত্ব করিতেন।* তাঁহার নাম গন্ধর্ব্ব সেন। ইহাঁর সময়েই মালবের প্রভূত উন্নতি হইতে থাকে। মালবরাজ গন্ধর্ব্বসেন বিশেষ যত্ন করিয়া উজ্জয়িনী নগরীকে সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ করিবার আয়োজন করিলেন। বাণিজ্য ভিন্ন দেশের উন্নতি হয় না, এজন্য গন্ধর্ব্ব সেন উজ্জয়িনীকে প্রধান বাণিজ্যস্থান করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহারই যত্নের ফলে শিপ্রা নদীর উভয়কূলে অহর্নিশ অসংখ্য বাণিজ্যতরণী নঙ্গর করা থাকিত। দেশ বিদেশের বণিকগণ এখানে

* কেহ কেহ বলেন তেরশত বৎসর।

ক্রেয় বিক্রেয়ের জন্য আগমন করিতেন। আর রাজ্যের যত লোক রাজধানীর সৌন্দর্য্য ও সম্পদ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইত। বাণিজ্য-লক্ষ্মীর প্রসাদে অচিরেই উজ্জয়িনী সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। এবং বহু দূর দেশ পর্য্যন্ত তাহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াই উজ্জয়িনী পৃথিবীবিখ্যাত নহে। যে জন্য উজ্জয়িনী জগতে সর্ব্বত্র পরিচিত ও সম্মানিত, আমরা আজ সেই বিবরণই বলিব। যত দিন মানব সমাজ রহিবে, ততদিনই উজ্জয়িনীর গৌবর উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। উজ্জয়িনীর সেই গৌরব মহারাজ বিক্রমাদিত্য, মহাকবি কালিদাস এবং বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা।

* * * *

* *

বিক্রমাদিত্য



রাজা গন্ধর্ব্বসেনের সোনার সংসারে সুখের সীমা ছিল না। হাতী, ঘোড়া, লোকলস্কর, সেপাই শাস্ত্রী, হীরা মাণিক জহরত কিছুরই অনটন ছিল না। রাজ্যের প্রজাগণ যেন সর্ব্বদাই সুখের জ্যোছ্‌নায় ডুবিয়া থাকিত। ছোট বড় কাহারও কোনও দুঃখ কষ্ট ছিলনা; তাহারা আপন আপন কাজ করিত, ঈশ্বরের নিকট রাজার মঙ্গল ও দীর্ঘজীবন কামনা করিত, আর পরম সুখে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব লইয়া দিন কাটাইত।

রাজার তিন রাণী—ছয়টী পুত্র। রাজকুমার-গণ সকলেই দেখিতে পরম সুন্দর। সকলেই সুশীল। তাহাদের নধর অধরে দিন রাত্রি হাসি লাগিয়াই থাকিত, আর সেই হাসির লহরে রাজপুরীর সবাই যেন আনন্দে আত্মা-হারা হইয়া যাইত।

বিক্রমাদিত্য

বড় রাজকুমার শঙ্কু দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনই সরল, শান্ত, উদার এবং মিষ্টভাষী ছিলেন। কর্ম্মচারীগণ ও প্রজাগণ শঙ্কুর আচরণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। দীন দুঃখীরা একটীবার বড় রাজকুমারের চোখে পড়িতে পাইলেই যেন স্বর্গলাভ করিত। শঙ্কু সেই মুহূর্ত্তে তাহাদের দুঃখ দূর করিয়া দিতেন। যে অনাথ বা শিশু,—রাজকুমারের দৃষ্টিতে পড়িলে—তাহার সকল অভাব ঘুচিয়া যাইত। রুগ্ন, অন্ধ আতুরদিগের জন্য কুমার শঙ্কু এক একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাদের সর্ব্ব-প্রকার সুখ শান্তির বন্দোবস্ত করিতেন। কুমার শঙ্কুর অতিথিশালায় অতিথিগণের জয়ধ্বনি উঠিত। কুমারের আর এক কার্য্য ছিল,—তিনি দিন রাত্রির অধিকাংশ সময় নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতেন। কিরূপে মানবের

দুঃখ দৈন্য আধিব্যাধির যাতনা দূর করা যায়, কুমার নির্জ্জনে বসিয়া তাহাই ভাবিতেন।

দ্বিতীয় রাজকুমার বিক্রমাদিত্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বলিষ্ঠ ও অতি চতুর ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, ইনি কোনও বিশেষ কার্য্য করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তৃতীয় কুমার ভর্ত্তৃহরি অতি সরল, উদার এবং ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। কনিষ্ঠ কুমার তিনজনের সংবাদ আমরা জানি না—জানিয়া দরকারও নাই। যাহাদিগকে লইয়া কাজ, তাহাদের কথা জানিলেই হইল।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিক্ষা।

রাজকুমারেরা পণ্ডিত মহেশ্বর উপাধ্যায়ের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। উপাধ্যায় সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পরমজ্ঞানী এবং ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাজধানীর কোলাহল ভালবাসিতেন না। কদাচিৎ রাজধানীতে পদার্পণ করিতেন। রাজবাটীর অনতিদূরে শিপ্রানদীর তীরে, বনপ্রান্তে তাঁহার কুটীর ছিল। কুটীরের চারিদিকে কত ফুলের গাছ, কত লতা—তাহাদের কি মনোহর ফুল। সেই ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত থাকিত। শাখায় শাখায় কত পাখী বসিয়া মধুর স্বরে গান করিত। কুটীরের আশে পাশে হরিণ

শিশু, আসিয়া ছুটাছুটি করিত ; ময়ূর পেকম ধরিয়া নাচিত। শিপ্রা নদী কুলু কুলু রবে বহিয়া যাইত। তাহাতে কত রঙ্গ বেরঙ্গের পাল তুলিয়া নৌকা চলিত—মাঝি মাল্লারা মনের সুখে গান গায়িত। অপর দিকে বিন্ধ্যগিরি প্রভাত ও সন্ধ্যায় সূর্য্যকিরণে অপূর্ব্ব শোভাময় দেখাইত। এই অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের মাঝখানে, গাছতলায়, ছোট কুটীর খানিতে, মৃগচর্ম্মে বসিয়া মহেশ্বর ভগবানের নাম গান করিতেন।

রাজকুমারেরা কয়টী ভাই সকাল বেলায় সোনার চতুর্দ্দোলে চড়িয়া পড়িতে আসিতেন। সঙ্গের লোকজন আশ্রম হইতে দূরে রাখিয়া কুমারেরা উপাধ্যায়ের নিকট আসিয়া বসিতেন। কুমারেরা পড়িতে বসিয়া ভক্তিভাবে গুরু-দেবের পদবন্দনা করিতেন, তারপর সরস্বতী-



কুমারেরা ভক্তিভাবে পড়িতে বসিতেন

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা

১০ পৃষ্ঠা

স্তোত্র পাঠ ও প্রণামাদি করতঃ মধুরকণ্ঠে গান করিতেন—

আজি বাণী পূজা, সাজা ভাই সাজা
হৃদয় আসন খানি।
এসেছি মন্দিরে, মানসোপচারে
পূজিবারে বীণাপাণি।
নন্দন কাননে, অমর ভবনে,
পুণ্যতীর্থধামে, পূত তপোবনে
যাঁর—বীণার ঝঙ্কারে বাজিছে মধুরে
মায়ের আশার বাণী।
এসেছি মন্দিরে নিয়ে অর্ঘ্যভার,
কর মহামন্ত্রে উদ্বোধন মা'র,
এসো—কুসুম অঞ্জলি দিয়ে সবে মিলি
পূজিব ভারতী বাণী।

কুমারেরা ভারতীর বন্দনা গাহিয়া পূজকের মত ভক্তিভাবে পড়িতে বসিতেন।



মহেশ্বর কুটীরের বাহিরে গাছের ছায়ায়, মধুর বাতাসে, মৃগচর্ম্মে বসিয়া পড়াইতেন, কুমারেরাও মৃগচর্ম্মে বসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। ইঁহারা তখন দস্তুর মত পড়ুয়া। সেই জ্ঞানী ব্রাহ্মণের মধুর ভাষায় কথিত সুললিত উপদেশ শুনিয়া কুমারেরা শীঘ্রই নানা বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ পাইয়া রাজা গন্ধর্ব্বসেনের কত আনন্দ। ছেলের প্রশংসা শুনিলে বাপমায়ের মনে যে সুখ হয়, আর কিছুতেই তেমন হইতে পারে না।

কুমারেরা যেমন বিদ্যাশিক্ষায় প্রশংসা পাইলেন, তেমনই যুদ্ধবিদ্যায়ও প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সেনাপতি সমরসিংহ ও অন্য একজন বিখ্যাত যোদ্ধা রাজকুমারগণকে অস্ত্র চালনা শিক্ষা দিতেন। কুস্তি, তরোয়াল খেলা,

তীর-চালনা, ঘোড়া ছুটাইয়া অন্যকে আক্রমণ, ইত্যাদি বিদ্যায় কুমারগণ কেহই কম রহিলেন না। সন্ধ্যাবেলায় মল্লভূমিতে মালকোঁচা মারিয়া, গায়ে মাটী মাখিয়া ইহারা কুস্তি করিতেন। কখন ভাইয়ে ভাইয়ে, কখন ওস্তাদজীর সঙ্গে লড়াই করিয়া বল এবং কায়দার পরীক্ষা করা হইত। কেহ বা ওড়া পাখী তীরে বিঁধিয়া বাহবা পাইতেন। একদিন কুমার বিক্রম এক হাতীর লেজে ধরিয়া বসিলেন—সে দিন হাতী বেচারীর কি দুর্গতিই না হইয়াছিল। সে কি আর ছুটিতে পারে? এতেই বুঝিতে পার—ইঁহাদের গায়ে কেমন জোর ছিল।

কুমার বিক্রম যেমন বিদ্যানুরাগী, তেমনই শক্তিমান, আবার তেমনই একগুঁয়ে ছিলেন।

ইহার মনের দৃঢ়তা দেখিয়া সময় সময় রাজা গন্ধর্ব্বসেনও বিস্মিত হইতেন।

কয়টী ভাইয়ে মিলিয়া মিশিয়া গলাগলি করিয়া সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভবিষ্যদ্বাণী।

একদা রাজা দরবারে বসিয়া আছেন। মন্ত্রিবর্গ, সেনাপতি, পারিষদমণ্ডলী এবং আরও কত লোকে দরবার গৃহ পরিপূর্ণ। রাজকুমারেরা সভায় প্রবেশ করিয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলেন। ঠিক সেই সময় তাহাদের পশ্চাতে এক দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী আসিয়া 'জয়োঽস্তু' বলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা শির নত করিয়া আশীর্ব্বাদ



রাজসভা ও সন্ন্যাসী।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।　　　　১৯ পৃষ্ঠা।

গ্রহণ করতঃ, সন্ন্যাসীকে উপবেশন করিতে বলিলেন।

সন্ন্যাসী বসিলেন না। রাজকুমারগণের অতি নিকটে আসিয়া, তাঁহাদের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করতঃ সস্নেহে কুমার বিক্রমাদিত্যের বাহুতে ধরিয়া কহিলেন—"মহারাজ! তোমার এই কুমার পরম সৌভাগ্যশালী হইবে। যত-দিন চন্দ্র সূর্য্য রহিবে, ততদিন জগতে সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের নাম লুপ্ত হইবে না। ইনি উজ্জয়িনীর সিংহাসনের ভাবী-সম্রাট্। ইনি উজ্জয়িনীর মুখ উজ্জ্বল করিবেন। যদি তত দিন বাঁচি, দেখিয়া জন্ম সার্থক করিব।

সন্ন্যাসী আর সেখানে দাঁড়াইলেন না; যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনই চলিয়া গেলেন। সভাসদ্‌গণ সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর সন্ন্যাসীর দিকে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

বিক্রমাদিত্য



রাজকুমার শঙ্কু কি জানি কেন হঠাৎ ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পর মুহূর্ত্তেই মাথা নত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দিন যায়। ক্রমে রাজা গন্ধর্ব্ব সেন রাজ-কার্য্যে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। এজন্য জ্যেষ্ঠ কুমার শঙ্কুকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং অবসর গ্রহণ করিলেন। এবং কিছুকাল মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

রাজা শঙ্কুকে প্রজাগণ পূর্ব্বেই ভালরূপ চিনিয়াছিল। এখন তাঁহার প্রজাপালন, প্রজাগণ ও অমাত্যগণের সহিত ব্যবহার এবং



জনসাধারণের সহিত শিষ্টাচার প্রভৃতি সদ্‌গুণ দেখিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। শঙ্কু নামে মাত্র রাজা—তিনি যাবতীয় কার্য্যই কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণের সহিত মিলিয়া করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব সেনের মৃত্যুর দুঃখ সকলেই সত্বরে ভুলিয়া গেল।

কুমার বিক্রমাদিত্য সময় সময় সেই সন্ন্যাসীর কথা ভাবিতেন। ভাবিতেন—'দাদার আচরণ, রাজ্যশাসন, প্রজাপালন অতি চমৎকার। দাদা কালে একজন আদর্শ নৃপতি হইবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু—কিন্তু—তথাপি যেন একটা অপূর্ণতা, একটা প্রাণহীন ভাব লক্ষ্য করিতেছি। দাদা যেন কলের পুতুলের মত কাজ করেন। আর কি যে চিন্তায় সময় সময় তন্ময় হইয়া থাকেন, ভগবানই জানেন'।

কুমার বিক্রমাদিত্যের রাজা হওয়ার বড়

সাধ হইত, কিন্তু পথ কোথায়? দাদাকে সিংহাসন হইতে সরাইয়া রাজা হওয়ার দুঃস্বপ্ন তাঁহার ত্রিসীমায়ও ঘেঁসিত না। যে যশস্বী হয়, যাহার নামে এক দিন পৃথিবী পূর্ণ হয়, সে কুকার্য্য করিবার কল্পনাও করে না।

তথাপি কথাটা বিক্রমাদিত্যের মনে উঁকি দিতে লাগিল। বিক্রমাদিত্য একদিন নিভৃতে কনিষ্ঠ ভর্ত্তৃহরিকে কহিলেন—"ভাই, সেই সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী মনে আছে কি?"

ভর্ত্তৃ।—কোন্ কথাটা দাদা!

বিক্রম।—একদিন বাবার সভায় আমরা গিয়াছিলাম। এক সন্ন্যাসী আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, ইনি উজ্জয়িনীর ভাবী সম্রাট্। তারপর আরও কত কথা সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন।

ভর্ত্তৃ।—হাঁ কতকটা মনে আছে বটে।

আমি তখন কিন্তু সন্ন্যাসীকেই দেখিতে ছিলাম। তাঁহার কথায়—আমার বড় মনোযোগ ছিল না। আহা—সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর দেহে কি জ্যোতিঃ, চক্ষুতে কি তেজঃ,—রাজা পর্য্যন্ত তাঁহাকে সম্মান করেন।

বিক্রম।—এই বুঝি তোমার ভাব উথলে উঠ্‌ল হরি!

ভর্ত্তৃ।—দাদা, এইত বেশ আছি। রাজা হওয়ার কি প্রয়োজন? রাজা হবার হাঙ্গামের চাইতে তুমি আমি কাব্য-চর্চ্চায়ই অনেক বেশী শান্তি পাই দাদা! তুমি না বলিয়াছ, শিকারে বড় সুখ। তবে তাহা নিয়াই থাক না কেন। আমাদের চক্ষে পৃথিবী যত সুন্দর, যত আনন্দ-দায়ক, রাজার চক্ষে তেমন নয়।

বিক্রম।—হরি! কাব্য কল্পনার খেলা মাত্র—সুন্দর, চিত্তহারী এবং আনন্দদায়ক বটে,

কিন্তু অবাস্তব। এই কাব্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহাকে বাস্তবে পরিণত করা প্রয়োজন। কাব্য যখন মানবের প্রাণ টানিয়া নিয়া আপনার মধ্যে তাহাকে জড়াইয়া ধরে, যখন কাব্যের ভাবতরঙ্গে দেশ স্বপ্নময় রাজ্যে ভাসিয়া, এক অব্যক্ত মধুর সঙ্গীতে তন্ময় হইয়া থাকে,—তখন কাব্য সফলতা লাভ করে। তেমন কাব্যত আমি পাইনা হরি! আমি যদি রাজা হইতাম—তাহা হইলে ভারতে একটা নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতাম। তাহা কাব্যের রাজ্য—ভাবের রাজ্য। সেই রাজ্যে যাবচ্চন্দ্র দিবাকর আমি সম্রাট্ হইয়া রহিতাম।

ভর্ত্তৃ।—আর আমি যদি তোমাদের মায়ার বন্ধন ছাড়াইতে পারিতাম,তাহা হইলে নির্জ্জন পর্ব্বত-গুহায় বসিয়া ভগবানকে ডাকিতাম।



সেই সাম্রাজ্যে যে সুখ, যে শান্তি—তাহা তোমার অর্থে নাই, রাজ্যে নাই, রাজ-পরিচ্ছদে নাই, কাব্যে নাই, দর্শনে নাই, মৃগয়ায় নাই, —ঐ মণিমুক্তা-খচিত সিংহাসনেও নাই।

বিক্রম। যা যা—তোর যত সব বাজে কথা। হরি! তুই যে নূতন কাব্য লিখিতেছিলি—

এমন সময় মহাকাল-মন্দিরে আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল; দুই ভাই দ্রুতপদে সেই প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এবং তাড়াতাড়ি যথাযোগ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মহারাজ শঙ্কুর সহিত মহাকাল মন্দিরে গমন করিলেন। সকলেরই পরিধানে কৌষেয় বস্ত্র, গলায় সুগন্ধি পুষ্পমাল্য, স্কন্ধে উত্তরীয়, নগ্নপদ:

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যখন রাজকুমার বিক্রম ও ভর্ত্তৃহরি কথা-বার্ত্তায় মগ্ন ছিলেন, তখন বিক্রমের ধাত্রী অন্তরাল হইতে সমুদয়ই শুনিল। তার পর সে রাক্ষসীর মত হৃদয় লইয়া কোথায় চলিয়া গেল।

কুমারেরা মহাকাল মন্দিরে যাইয়া আরতি দেখিলেন। ধূপধূনার গন্ধে, নানাবিধ ফুলের সৌরভে, প্রদীপাধারের সুগন্ধি তৈলের সুবাসে, মন্দিরপ্রাঙ্গন আনন্দময় এবং বাদ্য-ধ্বনিতে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। আরতি অন্তে কুমারেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া মহা-কালকে প্রণাম করিলেন,—পুরোহিত পূতবারি ছিটাইয়া কুমারগণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর মহাকালের নির্ম্মালা গ্রহণ করিয়া, সকলেই গৃহে প্রস্থান করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে রাজা কহিলেন, ভাই বিক্রম, মহাকালের প্রাঙ্গনে আসিলে যেন দেহ মন পবিত্র হয়। আমার মাথায় যদি সাম্রাজ্যের বোঝা না থাকিত, তবে এই মহাকাল মন্দিরেই জীবন কাটাইতাম। আর্ত্তের সেবা, রোগীকে ঔষধ দান, দুঃখীকে কোলে নেওয়া, আর ভগবানের নাম করায় যে সুখ—সে সুখ রাজত্বে নাই।

ভর্তৃহরি কহিলেন—ঠিক কথা দাদা!

বিক্রম কহিলেন,—দাদা! তোমাদের দুজনার ভাব দেখিলে আমার মনে হয়, তোমরা কোন্ দিন এই রাজ্যখানি শুদ্ধ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী করিয়া লও।

এই সকল কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে কুমারেরা গৃহে প্রবেশ করিলেন।

* * * * * *

হায় ! সেই কাল নিশা প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই রাজা শঙ্কুর জীবনলীলা শেষ হইয়া গেল। রাক্ষসী ধাত্রী রাজার খাদ্য সামগ্রীতে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিল। রাত্রিতেই রাজপুরীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। মন্ত্রী, সেনাপতি, বিক্রম, ভর্ত্তৃহরি ও অন্যান্য কুমার-গণ সকলেই হায় হায় করিতে লাগিলেন। ভিষক্ আসিলেন—কিন্তু তখন আর কোনও আশাই ছিল না।

প্রাতঃকালে নগরের সমুদয় লোক রাজ-বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সকলেই নবীন রাজার মৃত্যুতে হায় হায় করিতেছিল। কুমার ভর্ত্তৃহরি মহাকালের দ্বারে গিয়া যোড়হাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"ঠাকুর ! এইত বুঝি রাজার পরিণাম ! এই বুঝি মানবের শক্তি ! এই বুঝি তোমার লীলা।" ভর্ত্তৃহরি কয়েক

দিন একেবারে চুপ করিয়াই রহিলেন। দিনে দুইবার মহাকাল মন্দিরে যাইতেন মাত্র;— নতুবা তাঁহাকে আর কেহ দেখিত না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নবীন রাজার মৃত্যুতে দেশে বড় একটা শোকের ছায়া পড়িল। ছোট বড় সকলেই মহা দুঃখিত হইল।

এক রাজা গেলেই আর একরাজা হয়। রাজসিংহাসন কখনও শূন্য থাকে না। প্রজাগণ ও মন্ত্রিগণ কুমার বিক্রমকে রাজা করিল। এই অভিষেকের সময় দেশে কি উৎসবই না হইয়াছিল। তেমন উৎসব অনেক দিন এদেশে হয় নাই। উজ্জয়িনী

বিক্রমাদিত্য



রাজধানীর আকাশ সোনালী, রূপালী ঝক্‌ঝকে নিশানে ভরিয়া গেল। সেই সকল নিশানের উপর যখন প্রাতঃ-সূর্য্যের কিরণ পড়িত, তখন কারসাধ্য যে সে দিকে চায়। রাত্রিতে কত রকমের হাউই, কত রকম বাজীতে আকাশ ছাইয়া ফেলিত। তারপর বাদ্যভাণ্ডের হট্টগোলে কয়েক দিন কাণে কিছুই শোনা গেল না। এক এক জায়গায় কত সুন্দর সুন্দর তোরণ দ্বার ছিল, তাহার উপর রৌশন-চৌকীর মধুর বাদ্য; কোনস্থানে নাচগান, কোথায় বা তামাসা, কোথাও মজ্‌লিস জমিয়াছে। ছেলেপিলের দল পড়াশুনা বন্ধ করিয়া হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া ছুটাছুটি লাফা-লাফিতে দিন কাটাইতে লাগিল। পূজার মন্দিরে কত ধূমধামে পূজা হইতে লাগিল। ধূপধূনা, সুগন্ধি ফুল চন্দনের গন্ধে পূজার



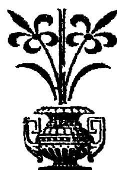
প্রাঙ্গন দেবদেশের মত মনোহর হইয়া উঠিল। সেখানে কত সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হইল। কত ভণ্ড আটা ঘি আপন ঝুল্‌নায় ভরিবার অছিলায়, লম্বা ফোঁটা, লম্বা জটা ও চিম্‌টা লইয়া খুব বাহবা দেখাইতেছিল।

স্থানে স্থানে খাবার জায়গা। অগণিত লোকজনকে ত আর একত্রে বসাইয়া খাওয়ানো চলেনা। তাই নানা জায়গায় খাবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বিশাল এক এক গোলায় সব খাবার জিনিস সাজানো। আর মানুষগুলা মণ্ডা মিঠাই এবং যে সব জিনিসের নাম চৌদ্দ পুরুষেও শোনে নাই, সে সব দ্রব্য ভরপেট খাইয়া, ঐ—ঐ—করিয়া উদ্গার করিতে-ছিল। কেহ বা পুটলি বাঁধিয়া খাদ্যসামগ্রী বাড়ীতে লইয়া যাইতেছিল। বড় বড় কুকুর গুলি মড়ার মত লম্বা হইয়া এখানে সেখানে

পড়িয়া রহিয়াছে ; চোখ মেলিতেও যেন আলস্য বোধ করিতেছিল। বন্দুক কামানের শব্দে পাখীগুলা দেশ ছাড়িয়া পলাইল। কেবল কাকগুলি কা কা করিয়া এক মহা হুলস্থূল করিয়া পলাইত, আবার পর মুহূর্ত্তে ফিরিয়া আসিত। লক্ষ লক্ষ লোকের চলা-ফেরায় নিরীহ ভাল মানুষদের পথচলাই বন্ধ হইবার যো হইল। দানে দেশে আর দরিদ্র রহিলনা। চারিদিকে কেবল "জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়" ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল।

ছেলের দল, যুবকের দল, নানা সাজে সাজিয়া বিবিধ রঙ্গের নিশান হাতে লইয়া রাজার জয়গান ও মঙ্গলপ্রার্থনাগীতি গায়িতে লাগিল। গ্রামে, নগরে, পথে পথে, রাজ্যময় প্রতি গৃহদ্বারে কলাগাছ রোপিত হইল।

তাহাতে সুন্দর সুন্দর নিশান ও সুগন্ধি ফুলের মালা দিয়া সাজান হইল। স্থানে স্থানে পূর্ণঘট, ফুলের মালা ও আম্রপল্লবে সজ্জিত। ঘরে ঘরে হুলুধ্বনি, শঙ্খনাদ, দেবালয়ে দেবালয়ে রাজ-মঙ্গল কামনায় পূজার মহোৎসব। সন্ধ্যার সময় হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত পথ ঘাট, বাড়ীঘর আলোক-মালায় সজ্জিত থাকিত। রাজভক্ত ভারতীয় প্রজাবৃন্দ, তাহাদের রাজার অভিষেকে প্রাণের আবেগে, মনের আনন্দে, কত উৎসব করিল,—আর প্রাণ খুলিয়া দেবতার নিকট রাজার মঙ্গল প্রার্থনা করিল।



অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাজকার্য্য।

বিক্রমাদিত্য অভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বাগ্রে উজ্জয়িনীর আদি-দেবতা মহাকালের দ্বারে প্রণাম করিয়া, রাজ্যের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন; এবং মহাসমারোহে মহাকালের পূজা সমাপন করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

রাজা হইয়া বিক্রমাদিত্য সর্ব্বপ্রথমে প্রজাগণের উন্নতি সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিলেন। কি করিলে প্রজাগণ সুখী হয়, তাহাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হয়, শিক্ষা ও ধন দেশকে গৌরবান্বিত করে, ইত্যাদি বিষয় তাঁহার চিন্তা করিতে হইল। বিক্রম জনসাধারণের

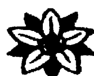
সুবিধার জন্য বড় বড় রাস্তা নির্ম্মাণ করাইলেন। রাস্তার পার্শ্বে স্থানে স্থানে পান্থ-নিবাস নির্ম্মিত হইল। সেই সকল পান্থনিবাসে রাজার ব্যয়ে, বিবিধ উৎকৃষ্ট আহার্য্য পথিকগণের তৃপ্তি সাধন করিত। চোর দস্যুর উপদ্রব হইতে জনগণকে নিরাপদ রাখিবার অভিপ্রায়ে উপযুক্ত শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করা হইল। চিকিৎসালয় সমূহ হইতে পীড়িত ব্যক্তিগণ বিনাব্যয়ে ঔষধ, পথ্য ও ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইত। বিশাল দীর্ঘিকা-সকল দেশের জলকষ্ট দূরীভূত করিল। শিল্প দ্রব্যের উন্নতির জন্য রাজা স্থানে স্থানে শিল্পাগার প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহাতে বিভিন্ন দেশ হইতে দক্ষ শিল্পী সকল বেতন প্রাপ্ত হইয়া লোক শিক্ষা দিত। দেশময় শিক্ষাবিস্তারের অভিপ্রায়ে রাজা প্রধান প্রধান নগর ও গ্রামে উপযুক্ত পণ্ডিত সকল

নিযুক্ত করিয়া, রাজব্যয়ে শিক্ষার্থিগণের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন, বিজ্ঞান, ন্যায়, জ্যোতিষ, উপনিষদ, বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে দেশের বহুলোক পাণ্ডিত্য লাভ করিতে লাগিল।

রাজার যত্নে উজ্জয়িনী এক প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠিল। শিপ্রানদীতে নানা দিগ্‌-দেশ হইতে কত জিনিস বোঝাই করিয়া বড় বড় নৌকাসমূহ উজ্জয়িনীর ঘাটে আসিয়া নঙ্গর করিত। লঙ্কা, সুমাত্রা, যাবা প্রভৃতি দ্বীপ সমূহ হইতে কত মণিমুক্তা, কত উৎকৃষ্ট পণ্য-দ্রব্য উজ্জয়িনীর বাজারে আসিয়া বিক্রীত হইত। হিমালয় হইতে মৃগনাভি ও চামর প্রভৃতি, কাশ্মীর, আফ্‌গানিস্থান, তিব্বত, চীন, আসাম প্রভৃতি স্থান হইতেও বহু দ্রব্য উজ্জয়িনীতে বিক্রয়ার্থ আমদানী হইত। উজ্জয়িনীর

বাণিজ্য-খ্যাতি দেশময় রাষ্ট্র হইয়াছিল। বাণিজ্য করিবার জন্য নানা দেশের নানাশ্রেণীর লোক উজ্জয়িনীতে অবস্থান করিত এবং দেশে যাইয়া উজ্জয়িনীর প্রশংসা করিত। এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নাম দেশ-প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল।

তিনি নিজে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতেন, কখনই তাহার অন্যথা হইত না। ধর্ম্মকার্য্য, আমোদ, ভ্রমণ, ব্যায়াম, রাজকার্য্য, পরিদর্শন ইত্যাদি সমুদয় বিভাগে স্বয়ং তদন্ত করিয়া বেড়াইতেন। রাজমন্ত্রী ও উপযুক্ত কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বদা রাজার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন।



নবম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাস।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য সর্ব্বদা রাজ্যের সংবাদ লইতেন এবং যথোপযুক্তরূপে সর্ব্বত্র রাজানুগ্রহ বিতরণ করিতেন। চারিদিকে তাঁহার প্রশংসা-ধ্বনি উঠিত—রাজা সহস্র মুখের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিতেন।

এই প্রশংসাবাণী সত্য কিনা, তাঁহার প্রত্যেক আদেশ নিয়মিতরূপে প্রতিপালিত হয় কিনা, প্রজার আবেদন নিবেদন রাজপুরুষ-গণ শ্রবণ করেন কিনা, ইত্যাদি বিষয় জানি-বার জন্য বিক্রমের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন—সভাসদ্‌বর্গ কি কেবল আমার মনস্তুষ্টির জন্যই আমার প্রশংসাবাদ

করে, না ইহাতে কোনও সত্য আছে ? আমি স্বয়ং ইহা পরীক্ষা না করিয়া পারিব না। আমার প্রজাগণ কি ভাবে দিন যাপন করে, তাহাদের কি অভাব আছে ইত্যাদি বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিব। এই সঙ্কল্প স্থির হইলে, একদিন বিক্রম কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরিকে মন্ত্রণাকক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

দুই ভাই কতক্ষণ বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিলেন। পরে বিক্রমাদিত্য কহিলেন, "হরি, আমার রাজ্য পরিচালনা কেমন হইতেছে ?"

বিনীত ভাবে ভর্ত্তৃহরি উত্তর করিলেন— "প্রজাগণ, মন্ত্রিগণ সকলেইত প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে আপনার সুখ্যাতি করে। সম্ভবতঃ, উত্তমরূপেই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।"

বিক্রমাদিত্য কহিলেন "সম্ভবতঃ, বলিলে কেন—ভাই!"

ভর্ত্তৃ।—দাদা, মানুষের মৌখিক প্রশংসার কোনও মূল্য নাই। মানুষ এমনই জাতি যে, সে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনির্ভর করিবার সাহস পায় না। যে দুই চারিজনের সে সাহস আছে, তাঁহারা মহাপুরুষ—জগতে দেবতা। তোমার ভয়ে বা মনোরঞ্জনের জন্য সুখ্যাতি প্রচার করা মানবের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। সুতরাং 'সম্ভবতঃ' না বলিয়া পারি নাই।

বিক্রম।—তবে রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা ঠিক রূপে জ্ঞাত হইবার কি উপায় আছে?

ভর্ত্তৃ। বিশ্বস্ত গুপ্তচর দ্বারা রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা জানা যাইতে পারে।

বিক্রম। গুপ্তচর যে প্রকৃত সংবাদ বহন করিবে, তাহারই বা প্রমাণ কি? যে সংবাদে

আমার বিরক্তির কারণ থাকিবে, তাহা কি আর গুপ্তচর আমার নিকট প্রকাশ করিবে ? এমন গুপ্তচর কি কেহ আছে, যে সাহস করিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, স্পষ্ট ভাষায় আমার একটী কুকার্য্য বর্ণন করিবে। আমি চিন্তা করিয়া এক উপায় স্থির করিয়াছি, তুমি সাহায্য করিলে আমি সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি।

ভর্ত্তৃহরি বিনীত ভাবে কহিলেন, "দাদা আপনার যে কোনও আদেশ আমি প্রাণপণে প্রতিপালন করিব।"

বিক্রমাদিত্য কহিলেন—"হরি, আমার ইচ্ছা, ছদ্মবেশে সমুদয় রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া রাজ্যের প্রত্যেক পল্লীর অবস্থা স্বচক্ষে দেখি, সঙ্গে সঙ্গে প্রজার সুখ দুঃখ নিজে অনুভব করি। দুঃখিতের দুঃখ নিজে দেখিলে মনে যে কষ্ট হয়, পরের নিকট শুনিয়া সে ভাব মনে হয় না—হইতেও

পারে না। পুত্রহারা জননীর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শুনিলে মনে যে ভাব হয়, পরের মুখের বর্ণনা শুনিয়া তাহা হয় কি? আমার বড়ই ইচ্ছা, নিজ চক্ষে অবস্থা দেখিয়া আসিব এবং যথাশক্তি তাহার প্রতীকার করিব। ততদিন তুমি প্রতিনিধি রূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কর।"

ভর্ত্তৃহরি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও রাজার মন ফিরাইতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবেই সম্মতি দান করিলেন। বিক্রমাদিত্য আনন্দিত মনে দেশ ভ্রমণের বন্দোবস্ত করিলেন।

একদিন নিশীথে রাজা বিক্রমাদিত্য ছদ্মবেশে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন, বৃদ্ধ মন্ত্রী, সেনাপতি ও ভর্ত্তৃহরি ব্যতীত রাজার উদ্দেশ্য আর কেহ জানিত না। বাহিরে প্রচার হইল, বিক্রমাদিত্য হরিদ্বার ভ্রমণে গমন করিয়াছেন।

যাহারা মনে করিয়াছিল, রাজা তীর্থে গমন করিলে তাহারাও অনেকে কাশী কাঞ্চী ঘুরিয়া আসিবে, তাহারা বড়ই দুঃখিত হইল। রাজবাড়ীর বড় বড় পেটুক "কাশীকা প্যাড়া" খাইতে না পারিয়া বিমর্ষ হইল। মোটকথা রাজা হঠাৎ চলিয়া যাওয়ায় এক এক জন এক এক রকম কল্পনা জল্পনা করিতে লাগিল। কেহ বলিল রাজা সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন, কেহ বলিল রাজাকে দণ্ডীর বেশে কাশীতে, সে নিজে দেখিয়া আসিয়াছে। কেহ বা প্রচার করিল স্বর্গ হইতে একটা সোনার রথ নামিয়া বিক্রমাদিত্যকে লইয়া ইন্দ্রের সভায় নিয়া গিয়াছে। যাহার যাহা ইচ্ছা বলিতে লাগিল। রাজার তীর্থভ্রমণ কথা কেহ কেহ বা বিশ্বাসই করিল না।

রাজা যিনিই হউন, দিন যাইতে লাগিল।

বিক্রমাদিত্য

ভর্তৃহরি রাজার প্রতিনিধিরূপে অতি সুন্দর ভাবেই রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজত্বে প্রজাগণ সুখে রহিল। রাজা ভর্তৃহরির সুনামেও দেশ পরিপূর্ণ হইল।

রাজা হইয়াও ভর্তৃহরির মনে সুখ রহিল না। তিনি যেন পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর মত কেবল পলায়নের জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। রাজকার্য্য গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ। চারিদিকে কেবল অভাব, কেবল অভিযোগ। আজ উহা চাই, কাল ইহা চাই, পরশ্ব দিন আর একটা নূতন কিছু চাই। অমুক বস্তু না হইলে চলে না, অমুক রকম নিয়ম প্রচলন আবশ্যক, ইত্যাদিতে ভর্তৃহরির মন বিষয়-বিরাগী হইয়া উঠিল। সংসারের সুখ, রাজভোগ, ধন দৌলতের গৌরববাহার, রাজ্য ঐশ্বর্য্যের মোহ, তাঁহার নিকট বড়ই কষ্টময় বোধ হইতে

লাগিল। যেন এই আপদ ছাড়িলেই তিনি বাঁচেন। এদিকে অগ্রজ মহাশয় তাঁহার হাতে রাজ্যভার দিয়া নিজ কার্য্যে গমন করিয়াছেন। এই ভার কাহার নিকট রাখিবেন, এই চিন্তায় ভর্তৃহরি অস্থির হইয়া উঠিলেন। আর এক মুহূর্ত্তও রাজপুরীতে থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইতে ছিলনা। সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল।

বিক্রমাদিত্যের কোনও ঠিক সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল না। ভর্তৃহরি নানাস্থানে লোক পাঠাইয়াও বিক্রমাদিত্যের সন্ধান পাইলেন না। অথচ এক মুহূর্ত্ত সময়ই যেন তাঁহার নিকট যুগান্তর মনে হইতেছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন বিক্রমের সন্ধান মিলিল না, তখন ভর্তৃহরি ভাবিলেন, আমার কার্য্য আমি করি, ভগবানের কার্য্য ভগবান্

করিবেন। এই পৃথিবী ভগবানের রাজ্য। তাঁহার রাজ্য, তিনিই রক্ষা করিবেন। বিক্রমাদিত্য রাজ্য মধ্যেই আছেন। আমি রাজ্যত্যাগ করিলেই, কোনও না কোনও রূপে তাঁহার নিকট সংবাদ পোঁছিবে। তখন তিনি বাধ্য হইয়াই রাজধানীতে উপনীত হইবেন। এই স্থির করিয়া গভীর রাত্রিতে রাজা ভর্ত্তৃহরি রাজবেশ ফেলিয়া সন্ন্যাসীর বেশে কোথায় চলিয়া গেলেন। রাজপুরী রাজ-শূন্য হইল। সেই নিশীথে উজ্জয়িনীর নরনারী স্বপ্নের ঘোরে যেন শুনিল, কে গাইতে গাইতে পথ চলিয়াছে—

"কেন গো আকুল বীণা অমন বিষাদে গা'য়,
আঁধারে চাঁদের আলো কেন গো নিবিয়া যায়।
ম্রিয়মাণ সমীরণ, গাহে বীণা সকরুণ,
আজি এ ধরণী যেন বিষাদে মলিনা হায়।

চলেছি আকুল প্রাণে ছাড়ি যত বন্ধুজনে
চলেছি তাঁহারি পাশে—যারে মন সদা চায়।”

দশম পরিচ্ছেদ।

রাজা না থাকিলে রাজ্যের বিশৃঙ্খলা নিশ্চয়ই ঘটিবে। এখন এই রাজ্য চালায় কে? প্রধান ত আর সকলে হইতে পারে না। যে সে একজন ত রাজা হইলে চলিবে না। যার তার রাজা হওয়া সাজে না। ঈশ্বর যাহাকে রাজার যোগ্য করিয়া পাঠাইবেন, সেই রাজা হইবে। রাজা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত। এজন্যই রাজাকে পৃথিবীর দেবতা বলে।

রাজার অভাবে উজ্জয়িনীতে বড়ই গোলযোগ পড়িয়া গেল। মন্ত্রীরা বহু চেষ্টা করিয়াও

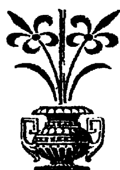


সকলকে সমান পরিতুষ্ট করিতে পারিলেন না। মন্ত্রীর আদেশ হয়ত কাহারও মনে ভাল লাগিল না, সে ভাবিল আমাদের রাজা থাকিলে এমনটা হইত না। বৃদ্ধমন্ত্রী বড়ই সতর্ক হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। আর দেশময় ঘোষণা করিলেন, 'রাজা ভর্ত্তৃহরি রাজ্য ছাড়িয়া বনে চলিয়া গিয়াছেন।'

বৃদ্ধ মন্ত্রী বিশেষ সাবধানতার সহিত রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার অনুপস্থিতে অন্য কোনও রাজা রাজ্য আক্রমণ করিতে পারে; কত দুষ্ট লোক গোপনে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া অনর্থ ঘটাইতে পারে, সুতরাং তিনি খুব সতর্ক রহিলেন। নূতন বা অপরিচিত ব্যক্তি নগরে প্রবেশ করিলে, তাহার সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিতেন। রাজপুরীর দ্বারে এক এক সৈন্যদল প্রহরী রাখা হইল।



মন্ত্রী মহাশয়ের আদেশ ব্যতীত কেহ পুরীতে প্রবেশের সুবিধা পাইত না। সেনাপতি মহাশয় অত্যন্ত সাবধানতার সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া সৈন্যগণের যুদ্ধপ্রণালী পরীক্ষা করিতেন। রাজ্যের সকল স্থান হইতে প্রতি-দিন যাহাতে সংবাদ সরবরাহ হইতে পারে, মন্ত্রী মহাশয় তাহারও বন্দোবস্ত করিলেন।



একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাবর্ত্তন।

রাজা বিক্রমাদিত্য সন্ন্যাসীর বেশে রাজ্যের সকল স্থান ঘুরিতে লাগিলেন। লোকে বিস্ময়ের সহিত দেখিত, এক দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়, আর মানুষকে সদুপদেশ প্রদান করে। সন্ন্যাসীর কথাগুলি অতি মিষ্টি; চক্ষু দুটী যেন করুণায় ভরা; উপদেশগুলি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত। কোথাও মানুষের অভাব দেখিলে সন্ন্যাসী সেখানে যাইয়া তাহার উপকার করেন; রোগীর রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে ঔষধ ও পথ্য দেন। এক একটী গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়ার সময়, সেই গ্রামের স্ত্রী পুরুষ সকলে তাঁহার সঙ্গে গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে চাহে।

কেহ বলিত সন্ন্যাসী বড় 'গুণী'—তিনি যাহা বলেন, তাহাই হয়। ইঁহার গুণে 'ছাই মুঠা—সোণা' হয়। কিন্তু সন্ন্যাসী বলিতেন, তিনি 'গুণ' বা 'জ্ঞান' জানেন না।

কাহারও অর্থের অভাব বা অন্য কোনও গুরুতর অভাব হইলে, কিম্বা কোনও দেশে খাদ্যের অভাব হইলে, সন্ন্যাসী সেখানের মানুষকে বলিতেন, "তোমরা রাজা ভর্ত্তৃহরির নিকট গিয়া বল, এক সন্ন্যাসী আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। মহারাজ, আমাদের এই অভাব আপনি মোচন করুন।"

সন্ন্যাসীর নাম শুনিয়া ভর্ত্তৃহরি বিক্রমাদিত্যকে চিনিতেন, তাঁহার আদেশ পালন করিতেন; কিন্তু সেখানে লোক পাঠাইলে আর তাঁহাকে পাইতেন না।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য ছদ্মবেশে সমুদয়



রাজ্য পরিভ্রমণ করিলেন। প্রজার সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ প্রত্যক্ষ ভাবে অবগত হইলেন। সর্ব্বত্রই নিজের সুযশঃ-গীতি শ্রবণ করিলেন। ইতিমধ্যে একদিন শুনিলেন, রাজভ্রাতা, রাজপ্রতিনিধি, ভর্ত্তৃহরি রাজ্যত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য এ সংবাদে বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার দেশভ্রমণে ব্যাঘাত জন্মিল। এমন অনুগত, বিশ্বস্ত ভ্রাতার এই আকস্মিক বৈরাগ্যের সংবাদে বিক্রমাদিত্য চিন্তাকুল চিত্তে, সত্বর রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সে সময় ত আর দেশে এখনকার মত রেলের গাড়ী ছিল না, যে মনে করিলে যেখানে সেখানে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাইবে। বিক্রমাদিত্যকে পদব্রজেই উজ্জয়িনীর দিকে

যাত্রা করিতে হইল। কিয়দ্দিন পরে তিনি একদা অপরাহ্নে ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করিয়া, মন্ত্রীবর্গের রাজ্যরক্ষার বন্দোবস্তের কথা লোকমুখে শ্রবণ করতঃ অতিশয় প্রীত হইলেন। রাজার অনুপস্থিতির সময়েও প্রজা-গণ রীতিমত সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, জানিয়া রাজা সুখী হইলেন।

রাজা ছদ্মবেশেই নগরের বাজারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রায় মধ্যরাত্রিতে যখন দোকান পাট বন্ধ হইতেছিল, সন্ন্যাসী তখন "জয় মহাকাল" বলিয়া গাত্রোত্থান করতঃ, মৃদু মৃদু গান করিতে করিতে রাজপুরীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে উজ্জয়িনীর বিনিদ্র নরনারী শুনিল, জ্যোৎস্নাবিধৌত মধ্যরাত্রিতে কে যেন গম্ভীর কণ্ঠে সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ করিতেছে। সন্ন্যাসী গাইতে গাইতে ধীরে ধীরে চলিলেন।

সন্ন্যাসী গাহিলেন ঃ—

“সত্য সুন্দর শিব, বিভাতি হৃদয় মন্দিরে।
জ্ঞানের আলোক বিতর নয়নে
পড়েছি বিষম তিমিরে ॥”

* * * *

সন্ন্যাসীও অকস্মাৎ শুনিলেন, কে যেন সুমধুর কণ্ঠে গাইতেছে—

বাজাও তোমার স্বর্ণ-বীণা ভুবন ভরিয়া ঝঙ্কারে,
তোমার আশীষে, সুধার সুধারা ঝরিবে অম্বরে।
জননি ! তোমার বীণার তানে,
বেদবেদান্ত ঋক্ সামগানে,
নিখিল ধরণী পুলকে সুছন্দে বন্দিছে তোমারে।
দিয়ে নব আশা নবীন জীবন,
কর মা ধরণী অমর ভবন,
ধন্য পুণ্যময় মানব জীবন—পূজিয়ে তোমারে।”

সেই সঙ্গীত ধারা—জ্যোৎস্নার সঙ্গে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে রাজপুরীর চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার পশ্চাতে দুই তিন জন গুপ্তচর সতর্ক ভাবে অনুসরণ করিতেছে। সন্ন্যাসী দ্বারে আসিয়া দেখিলেন, একদল সশস্ত্র সৈনিক দ্বাররক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছে। এমন সময় বৃদ্ধ মন্ত্রীমহাশয় ও নগরপাল, নগর পরিভ্রমণ করিয়া দ্বারে আগমন করিলেন। তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন—মাথায় জটা, মুখে সুদীর্ঘ দাঁড়ি, গায়ে ভস্ম, গলায়, বাহুতে রুদ্রাক্ষমালা, এক উন্নতকান্তি সন্ন্যাসী দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। মন্ত্রীমহাশয় বিশেষ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া, হঠাৎ ঘোড়া হইতে নামিলেন এবং আনন্দে দুই বাহু তুলিয়া "মহারাজ

বিক্রমাদিত্য কি জয়" বলিয়া উঠিলেন। অভিবাদন করিয়া মন্ত্রী মহাশয় কহিলেন, "মহারাজ, আর ছদ্মবেশ কেন ?"

সেই মুহূর্ত্তে সৈনিকমণ্ডলী আনন্দে মুহুর্মুহুঃ বিক্রমাদিত্যের জয় ঘোষণা করিল। তাহাদের সেই গভীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মধ্য-রাত্রিতে উজ্জয়িনী জাগিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে নগরবাসী আসিয়া রাজদ্বারে সমবেত হইল এবং মহারাজের আগমনে পরম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। মহারাজ সকলের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।



দ্বিতীয় খণ্ড।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

কালিদাস।

রাজকন্যা কমলাদেবী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে পণ্ডিত বিচারে তাঁহাকে হারাইতে পারিবে, তাহার সহিতই বিবাহ হইবে। তাঁহার এই সঙ্কল্প শুনিয়া নানাদেশ হইতে পণ্ডিতগণ বিচার করিতে আসিতেন। কিন্তু কমলাদেবীর চক্রান্তে পণ্ডিতগণ পরাজিত হইতেন।

একদিন কয়েকজন পণ্ডিত রাজকুমারীর সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া বাড়ী যাইতে-



ছিলেন; মনে কতই দুঃখ,—একটা মেয়ের সহিত বিচারে হারিতে হইল! পণ্ডিতেরা এই দুঃখে নিঃশব্দে চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ দেখিলেন, এক নবীন রূপবান্ যুবক গাছের ডালে বসিয়া, সেই ডালেরই গোড়া কাটি-তেছে। তাঁহারা ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, "ওহে, তুমি শীঘ্রই মাটীতে পড়িয়া যাইবে।" কিন্তু সে সহজে উহা বুঝিল না। অতঃপর ব্রাহ্মণেরা তাহাকে ডাকিয়া নীচে আনিলেন।

ব্রাহ্মণেরা পরামর্শ করিলেন, এই মূর্খ অপদার্থটাকে রাজকন্যার সহিত বিচার করিতে লইয়া যাইব। তবেই তাহার বিদ্যার অহঙ্কার চূর্ণ হইবে। এই পরামর্শ করিয়া পণ্ডিত মহাশয়েরা উহাকে লইয়া রাজবাটীতে উপনীত হইলেন। এই মূর্খ ই কালে কালিদাস নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

পণ্ডিতেরা রাজকন্যাকে কহিলেন, একজন মহাপণ্ডিত আপনার সহিত বিচার করিতে আসিয়াছেন ; ইনি বাগ্‌বিতণ্ডাদ্বারা বিচার করেন না, ইঙ্গিতেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন।

যথাসময়ে সভায় বিচার আরম্ভ হইল। কালিদাস প্রথম প্রশ্নের উত্তরে নিঃশব্দে রাজকন্যাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইলেন। কুমারী আনন্দিত হইলেন। বাস্তবিক উহাই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর। কুমারী পুনরায় প্রশ্ন করিলে, কালিদাস দুইটী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইলেন। রাজকন্যা আনন্দে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া কালিদাসের গলায় বরমাল্য প্রদান করিলেন। পণ্ডিতগণ বিদায় হইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

রাজবাড়ীতে বিবাহের ধূম পড়িয়া গেল।



নহবত বাজিল। আয়োজন আড়ম্বরের আর অবধি রহিল না। যথাসময়ে শুভলগ্নে রাজকন্যার সহিত 'মূরখ্-পঞ্চানন' কালিদাসের বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের পর কালিদাস ও কমলাবতী বসিয়া আছেন, এমন সময় রাজবাটীর অদূরে একটা উষ্ট্র চীৎকার করিয়া উঠিল। রাজকন্যা ভাবিলেন, স্বামীর নিকট উষ্ট্র সম্বন্ধে একটী সরস কবিতা শুনিবেন। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওটা কিসের শব্দ ?" কালিদাস কহিলেন—'উষ্ট'। কমলা চমকিত হইলেন। তাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বলিলে ?

কালিদাস পুনরায় বলিলেন—"উট্র।" তখন আর সন্দেহ রহিল না। রাজ-কন্যা কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে

লাগিলেন। "দেশের কত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, কত রূপবান গুণবান্ রাজকুমার আমাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছিল। শেষটা এই হতভাগ্য মূর্খের সহিত আমার বিবাহ হইল!" কমলাবতী কর্কশকণ্ঠে স্বামীকে কহিলেন—যাও মূর্খ—এখনি বাহির হইয়া যাও—এখানে তোমার স্থান নাই—যাও—গণ্ডমূর্খ, অপদার্থ—

কালিদাস ভীত হইয়া, সেই অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনের মধ্যে বড় ধিক্কার জন্মিল। একটা মেয়ে আমাকে গালি দিয়া বাহির করিয়া দিল। লেখা-পড়া শিখি নাই, তাই আমার এই দুর্গতি। নিজের স্ত্রীই যখন এত অপমান করিল—তখন ত আমার লোক সমাজে মুখ না দেখানই উচিত। ছিঃ ছিঃ—আমার বাঁচিয়া থাকার



কি প্রয়োজন! আমি আজই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু-জলে ভাসিতে ভাসিতে কালিদাস অরণ্য পথে চলিলেন। গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটী জলপূর্ণ কুণ্ড। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উঠিতেছে; পাখীগুলি আনন্দে গাহিয়া উঠিয়াছে। কালিদাস চক্ষু মুছিয়া কহিলেন—'সূর্য্য মামা—এই শেষ দেখা'। 'মা ভগবতী! মূর্খের স্থান দাও' বলিয়া সেই কুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বরলাভ।

অনেকে ধূলির মধ্যে মাণিক পায়, ছাই উড়াইয়া রতন লাভ করে, নদীর বালুকাময় চড়ভূমিতে কোহিনূর প্রাপ্ত হয়। কালিদাসেরও তাহাই হইল। প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে গিয়া অমর হইয়া আসিলেন।

কালিদাস যে কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, উহা সরস্বতীকুণ্ড। কুণ্ডে ব্রহ্মহত্যা হয় দেখিয়া ভগবতী বীণাপাণি কুণ্ডের ভিতরেই কালিদাসকে কহিলেন, "যাও বৎস, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি এই মুহূর্ত্তে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইবে। তোমার নাম 'যাবচ্চন্দ্র দিবাকর' সকলের নিকট আদরণীয় হইয়া

রহিবে।” কালিদাস কুণ্ড হইতে তীরে উঠিয়া কাপড়ের এক প্রান্তে সর্ব্বাঙ্গ মুছিলেন। তারপর কুণ্ডের তীরে আসন করিয়া বসিয়া ডাকিলেন “মা, একবার তোমার জ্ঞানদায়িণী মূর্ত্তিতে দেখা দাও।” অমনি দশদিক এক স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত হইয়া উঠিল। মধুর বীণাধ্বনিতে যেন আনন্দ গলিয়া পড়িতে লাগিল। কালিদাস চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে মহিমাময়ী সরস্বতী আবির্ভূ তা হইয়াছেন। কালিদাস গলায় কাপড় দিয়া, মায়ের চরণে প্রণাম করিয়া, মায়ের রূপবর্ণনা করিতে লাগিলেন ঃ—

তরুণ শকলমিন্দোবিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষন্না সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী পুস্তক শ্রীঃ
সকল বিভব সিদ্ধৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ।

বিক্রমাদিত্য

দেখিতে দেখিতে সেই দেবীমূর্ত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল। কালিদাস নয়ন মুদিত করিয়া গায়িতে লাগিলেন—

বাজাও বীণা বীণাপাণি! নূতন সুরে।
যে সুরে শুনালে বীণা বনে রত্নাকরে,
আজি বাজাও বাণি! সেই রাগিনী বীণার ঝঙ্কারে,
শুনাও ভারতেরে॥

আঁধারে ঘুমিয়ে আছি, নেহার জননি!
আজি, রুদ্রতেজে মন্ত্র ছড়াও মৃতসঞ্জীবনী,
বাঁচাও সন্তানেরে।

দীপকে বাজা মা বীণা, ঘুমের ঘোর যাক্ ছুটে,
যেন, মায়ের নামে হৃদয় মাঝে,
আশার আলোক ফোটে,
জনম ধন্য করে।

জননি ! তোর প্রেমনীরে দিবানিশি ভাসি,
আমি, চাইনা ধর্ম্ম-কাম-মোক্ষ ধনমাণিকের রাশি
রেখো কাঙাল করে।

কালিদাসের স্বরলহরী দশদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার হৃদয়ে আজ কি আনন্দ ! শতজন্ম সাধনায় মানব যাহা পায় না, দেবীর কৃপায় এক মুহূর্ত্তে কালিদাস সেই অতুল সম্পদ প্রাপ্ত হইলেন। আজ আর তাঁহার মনে দুঃখ নাই। তিনি বুঝিলেন, পত্নী তাহাকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া না দিলে, আজ এই সৌভাগ্য লাভ ঘটিত না। কালিদাস আনন্দিতমনে রাজবাটী অভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন।

রাত্রিতে যে কাণ্ডখানা হইয়া গিয়াছে,—কমলাবতী স্বামীকে যে তাড়াইয়া দিয়াছেন, এ

সংবাদ এখনও রাজপুরীতে কেহই জানিতে পারে নাই। কমলাবতী মনের দুঃখে সারারাত্রি রোদন করিয়া, সকালে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। অনেক বেলা উঠিয়াছে, তখনও তাঁহার প্রকোষ্ঠের দ্বার অবরুদ্ধ। এমন সময় নব-গৌরব-মণ্ডিত কালিদাস আসিয়া উপনীত হইলেন। দাসীগণ সসম্ভ্রমে সরিয়া গেল।

কালিদাস কমলাবতীর কবাটে করাঘাত করিলেন, কমলাবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বিরক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—কে রে ?

মৃদুহাস্য করিয়া কালিদাস কহিলেন,—

"অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌বিশেষঃ।

মহানন্দে রাজকন্যা কালিদাসকে ঘরে লইয়া, তাঁহার পায় পড়িয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কালিদাস সমুদয় বৃত্তান্ত কমলাবতীর নিকট জানাইলেন।

কমলাবতী কালিদাসকে কহিলেন—তুমি আমাকে প্রথমে যে শ্লোকটী শুনাইলে, তাহার প্রত্যেক শব্দদ্বারা এক একটী নূতন কাব্য রচনা করিয়া আমাকে সুখী কর।

কালিদাস তাহাই করিলেন। তিনি "অস্তি" শব্দ দ্বারা কুমার সম্ভব (উমার বিবাহ কাব্য) কাব্য আরম্ভ করিলেন।* "কশ্চিৎ" শব্দদ্বারা মেঘদূত † এবং "বাক্" ‡ শব্দ দ্বারা রঘুবংশ কাব্য আরম্ভ করেন। কিন্তু "বিশেষ" শব্দ দ্বারা তিনি কোনও কাব্য রচনা করিয়াছেন কিনা জানা যায় নাই। রচনা করিয়া থাকিলেও তাহা পাওয়া যায় নাই।

* "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয় নাম নগাধিরাজঃ"।

† "কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ"।

‡ "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে"।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজধর্ম্ম।

বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে বসিয়া রাজ্যের সকল অভাব দূরীকরণে মনোনিবেশ করিলেন। এবার স্বচক্ষে সাম্রাজ্য পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, প্রজার সুখ দুঃখ অভাব সকলই দেখিয়া আসিয়াছেন। প্রজার মনোগত ভাব জানিয়াছেন, তাই সকলের অভিযোগ দূর করিতে যত্নপর হইলেন।

বিক্রমাদিত্য নিজে বিদ্বান্ ছিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন, বিদ্যাচর্চ্চা ব্যতীত দেশের প্রকৃত উন্নতি হয় না। মূর্খের সংসর্গে মানুষের সমুদয় গুণ নষ্ট হয়। সুতরাং মূর্খত্ব দূর করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রয়োজন।



বিদ্যাচর্চ্চার জন্য তিনি দেশের প্রধান প্রধান শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। তাঁহাদের বিচার শুনিয়া, স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া, প্রধান প্রধান পণ্ডিত-গণকে বিশেষ বৃত্তি দিয়া রাজধানীতে স্থাপন করিলেন। রাজসভায় কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন, ন্যায়, জ্যোতিষ, গণিত, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের চর্চ্চা হইতে লাগিল। উজ্জয়িনীর রাজধানী সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র-স্থল হইয়া উঠিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য বাছা বাছা নয় জন পণ্ডিত লইয়া এক পণ্ডিত সভা গঠন করিলেন। ঐ সভাই পৃথিবীতে "নবরত্ন সভা" নামে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এই নবরত্ন সভায় জগদ্বিখ্যাত মহাকবি কালিদাস, জ্যোতিষীপ্রধান বরাহ মিহির; বৌদ্ধ-পণ্ডিত বিখ্যাত অমরকোষ, অভিধান-

প্রণেতা অমরসিংহ, বৈয়াকরণ পণ্ডিত বররুচি, চিকিৎসা বিদ্যাবিশারদ ধন্বন্তরী, অলঙ্কারশাস্ত্র প্রণেতা দার্শনিক শঙ্কু, দার্শনিক পণ্ডিত ক্ষপণক ও ঐতিহাসিক বেতাল ভট্ট প্রভৃতি দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান ছিলেন। নবরত্ন সভার প্রধান পণ্ডিত মহাকবি কালিদাস জগতের শ্রেষ্ঠ কবি। আজিও পৃথিবীর পণ্ডিত সমাজ নবরত্ন সভার সম্মান করিয়া থাকেন। একত্রে এত অধিক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সমাবেশ পৃথিবীর কোনও রাজার সময়েই হয় নাই। বিক্রমাদিত্য এই নবরত্ন সভার জন্যই আজিও জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন। নতুবা তাহার মত ক্ষমতাশালী অনেক রাজাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য সমুদয় রাজ্য মধ্যেই



বিদ্যালোচনার সুবিধা করিলেন। দেশের প্রতি ঘরে যাহাতে বিদ্যার চর্চ্চা হয়, সে দিকে রাজার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। তিনি নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন। রাজার বৃত্তি পাইয়া পণ্ডিত-গণ মহা উৎসাহে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত ছাত্রগণ প্রচুর বৃত্তি ও পুরস্কার পাইয়া পড়িতে লাগিলেন। রাজার কর্ম্মচারিগণ বিদ্যালয় সমূহের সংবাদ লইতেন এবং ছাত্র ও অধ্যাপকগণকে উৎসাহ দিতেন। এইরূপে অতি শীঘ্রই রাজ্যময় বিদ্যার চর্চ্চা বিস্তৃতি লাভ করিল। শাস্ত্রচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে দেশে ধর্ম্মালোচনা হইতেছিল। নীতি শাস্ত্রের উপ-দেশ এবং রাজার বৃত্তিপ্রাপ্ত ধর্ম্মপ্রচারকগণ দেশময় ভ্রমণ করিয়া, ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। বাণিজ্য, বিদ্যাশিক্ষা

এবং ধর্ম্মালোচনার জন্য অনতিকাল মধ্যেই বিক্রমাদিত্য ভারতে আদর্শ রাজা বলিয়া পরিচিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদা রাজার জয়গান হইতে লাগিল।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য দেশের সর্ব্বত্র গমনাগমনের সুবিধার জন্য বিস্তৃত রাজপথ নির্ম্মাণ করাইলেন। রাজপথের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ করিলেন। শ্রান্ত পথিকগণ বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিত। স্থানে স্থানে পান্থশালা স্থাপন করিলেন; জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেই এই সকল পান্থশালায় আহার্য্য ও আশ্রয় প্রাপ্ত হইত। রাজার প্রতিষ্ঠিত ঔষধালয় সমূহ হইতে রাজ্যের পীড়িত নরনারী বিনাব্যয়ে ঔষধ পাইত। রাজার শান্তিরক্ষকগণ অপরাধীর অনুসন্ধান করিত এবং দোষী ব্যক্তিগণ কঠোর দণ্ড ভোগ করিত। ইহাতে

রাজ্যের সর্ব্বত্রই চোর ও দস্যুর উপদ্রব লোপ হইয়াছিল। সমুদয় রাজ্যখণ্ড যেন শারদজ্যোৎস্নায় শান্তিতে পড়িয়া সুখের স্বপ্নে বিভোর ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নবরত্ন।

১। **কালিদাস**—কালিদাসের কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। কালিদাসের উৎপন্নবুদ্ধি অতি আশ্চর্য্য ছিল। কালিদাস এই বুদ্ধি-বলে দেশের প্রায় সকল পণ্ডিতকেই বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কালিদাস রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, মেঘদূত, ঋতু-সংহার,

নলোদয় প্রভৃতি কাব্য ; শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র প্রভৃতি নাটক এবং শ্রুত-বোধ নামক ছন্দঃগ্রন্থ রচনা করেন। কালিদাস সম্বন্ধে বহু সুন্দর সুন্দর গল্প আছে।

(১) কালিদাস একবার কর্ণাটের রাজ-সভায় ছদ্মবেশে গিয়াছিলেন, সঙ্গে ভৃত্যবেশে ছিলেন বররুচি। কর্ণাট সভায় বল্লন পণ্ডিত নামে একজন কবি থাকিতেন। বড় পণ্ডিত কেহ রাজসভায় আসিতে চাহিলে, বল্লন তাহাকে রাজবাড়ীর নিয়ম মত অর্ঘ্যাদি প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দিতেন,—সভায় যাইতে দিতেন না। আর যাহারা সামান্য শিক্ষা করিয়া পণ্ডিত হইয়াছে, বল্লন তাহাদিগকে রাজসভায় লইয়া, বিচারে পরাস্ত করতঃ বাহবা পাইতেন। এই সংবাদ কালিদাসও জানিতেন। সেইজন্য তিনি বল্লনের সঙ্গে দেখা করিয়া, এমন একটী

কবিতা পাঠ করিলেন—যে তাহার না আছে অর্থ, না আছে ভাব। বল্লন সেই কবিতা শুনিয়া পরম যত্নে ইহাকে রাজসভায় হাজির করিলেন। কালিদাস সেখানে যাইয়া অতি উৎকৃষ্ট শ্লোক রচনা করতঃ রাজাকে অভিনন্দন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্য বররুচিও শ্লোক বলিয়া ফেলিলেন। রাজা ও বল্লন সকলেই অবাক্। পরে পরিচয় হইল এবং তাঁহারা উভয়েই প্রভূত সম্মান প্রাপ্ত হইলেন।

(২) একদিন বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"কালিদাস, আমি কোন্ পুণ্যফলে রাজা হইয়াছি—তাহা তোমার বলিতেই হইবে।" তিনি বাড়ী আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। স্নান আহারের সময় চলিয়া যায়, কালিদাসের যেন চৈতন্য নাই। এমন সময় তাঁহার মেয়ে



আসিয়া ডাকিল—বাবা তুমি যা ভাব্‌ছ, তাহার উত্তর করা যাইবে—তুমি খাও গে। কালিদাস চমকিত হইলেন, মেয়ে আমার মনের ভাব কিরূপে জানিল? কিন্তু অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াও তিনি মেয়ের নিকট কিছু জানিতে পারিলেন না। আহারান্তে মেয়ে বলিল—বাবা এই পথে যাও, দেখিবে একজন কুমারিণী পাতিল গড়িতেছে, সে তোমাকে সকল কথা বলিতে পারিবে।

কালিদাস কুমারিণীকে যাইয়া বলিলেন—সে বলিল—হাঁ তা আমি জানি বটে, কিন্তু বলিব না। এই পথে যাও—বিজন মাঠে একটী দীঘি আছে, সেই দীঘির পাড়ে দাঁড়াইয়া তিনবার হাততালি দিও, তবেই জানিতে পারিবে। কালিদাস চলিলেন; দীঘির পাড়ে যাইয়া হাততালি দেওয়া মাত্র, একটী সুন্দরী



স্ত্রীলোক জলে ভাসিয়া উঠিল, তাহার মাথায় কাপড় নাই। কালিদাস তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—আমিও বলিব না। এই পথে যাইয়া দেখ এক বাড়ীতে একটী ছেলে জন্মিয়াই মরিয়া গিয়াছে। তুমি সেই মরা ছেলেকে লইয়া একটী নির্জ্জন ঘরে প্রবেশ করতঃ, ছেলের গালে সজোরে এক চাপড় দিও—তখন ছেলে কথা কহিবে। তাহার নিকট তুমি সকল কথা জানিতে পারিবে।

কালিদাস তাহাই করিলেন। তখন সেই ছেলে বলিতে লাগিল—পূর্ব্বজন্মে বিক্রমাদিত্য অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন; ভিক্ষায়ও দিন চলিত না। ব্রাহ্মণের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও পুত্র-বধূ ছিল। একদিন ভিক্ষার চাউল রাঁধা হইতেছে, এমন সময় এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া অতিথি হইলেন। ব্রাহ্মণ স্ত্রীর নিকট



অতিথির কথা বলিলে তিনি বলিলেন— "নিজের খাবার সংস্থান নাই—আবার অতিথি।" এই বলিয়া তিনি ভাতের পাতিল ফেলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বাপের বাড়ী চলিয়া গেলেন। তিনি এজন্য ঐ কুম্ভকার গৃহিণী। আর ব্রাহ্মণের পুত্র—তাহার নিজের অংশ ভাত গোপনে লইয়া পলায়ন করিল। সেই—আমি। এখনও লোকসমাজে মুখ দেখাইতে আমার লজ্জা হয়। তাই জন্ম গ্রহণ করিয়াই মরিয়া যাই। পুত্রবধূর নিকট ব্রাহ্মণ ভাত চাহিলেন—সে ক্রোধে শ্বশুরের দিকে পেছন ফিরিয়া চলিয়া গেল— তাই সে দীঘির জলে ডুবিয়া আছে—লোককে লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারে না। তখন কন্যাটী ব'লিল "বাবা, এত ব্যস্ত কেন—আমার ভাত আর তোমার ভাত অতিথিকে দিব—চল। সেই কন্যাই আজ তোমার ঘরে। আর সেই

ব্রাহ্মণ, অতিথি সেবার ফলে আজ মহারাজ বিক্রমাদিত্য।

২। বররুচি—ইনি প্রাকৃতপ্রকাশ নামক একখানি প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণ, একখানি সংস্কৃত অভিধান, নীতিরত্ন নামক একখানি ক্ষুদ্রকাব্য এবং বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান রচনা করেন।

৩। ধন্বন্তরী—ইনি চিকিৎসা শাস্ত্রে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন।

৪। ক্ষপণক—নানাশাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল।

৫। বেতাল ভট্ট—ইনি "বেতাল পঞ্চ-বিংশতি" নামক অতি সুন্দর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে লইয়াই উহা রচিত হয়। 'নীতি-প্রদীপ' নামক ইহার একখানি ক্ষুদ্র কাব্যও আছে।

৬। শঙ্কু—ইনি যে সকল শ্লোক রচনা করেন তাহার অনেকগুলিই সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ "কাব্যপ্রকাশে" প্রমাণ রূপে গৃহীত হইয়াছে।

৭। অমরসিংহ—ইনি বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। গয়ার প্রধান বৌদ্ধ মন্দির ইঁহার নির্ম্মিত, এরূপও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। অমরসিংহ 'অমরকোষ' নামক একখানি উৎকৃষ্ট অভি-ধান রচনা করেন। ইনি আরও অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। প্রবাদ, শঙ্করাচায্য ঐ সকল গ্রন্থ দগ্ধ করিয়া ফেলেন।

৮। ঘটকর্পর—ইনি কালিদাসের প্রতি-দ্বন্দী কবি ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহার ক্ষমতা কালিদাসের তুলনায় অতি সামান্যই ছিল। ইঁহার নীতিসার নামক এক

খানি ২১টী শ্লোকময় কবিতা পুস্তক আছে। মহাকবি কালিদাস একটী কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

"গুণরাশি মাঝে দোষ কণা মাত্র যার,
চন্দ্রের কলঙ্ক সম—প্রভা নাহি তার।"

ঘটকর্পর ইহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন—

"একদোষে নাহি নাশে গুণ রাশি রাশি ?
—চন্দ্রের কলঙ্ক সম রহে নিমজ্জিত
দারিদ্র্য—বিষম দুঃখ গুণরাশি-নাশি,
দেখেনি সে জন ভবে, একথা নিশ্চিত।

ঘটকর্পর একখানি কাব্য লিখেন, তাহা যমকালঙ্কার পূর্ণ ছিল। তিনি অহঙ্কার করিয়া লিখিয়াছিলেন, যে যমকালঙ্কার রচনা করিয়া আমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে, আমি কলসী

ভরিয়া তাহার জল বহন করিব। কালিদাস কিন্তু এই জন্যই যমকালঙ্কারপূর্ণ নলোদয় রচনা করেন। তবে ঘটকর্পর তাহার চাকুরী করিয়াছিলেন কি না জানা যায় নাই।

৯। বরাহমিহির—বরাহ একজন অসাধারণ জ্যোতিষী ছিলেন। ইনি বৃহৎ সংহিতা রচনা করেন। মিহির বরাহের পুত্র।

মিহিরের স্ত্রীই জগদ্বিখ্যাত 'খনা'। খনার বচন আজিও ঘরে ঘরে স্ত্রী পুরুষে আবৃত্তি করিয়া থাকেন। খনার মত জ্যোতির্বিবিদ্যায় পণ্ডিত আর দেখা যায় নাই। কথিত আছে, বরাহ, মিহিরের জন্ম দিনে গণনা করিয়া দেখিলেন, পুত্রের আয়ুঃ মাত্র ১০ বৎসর। বরাহ গণনায় এক শূন্য ভুল করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে মিহিরের আয়ুঃ ১০০ বৎসর। পুত্রের আয়ুষ্কাল অতি কম হওয়ায় বরাহ

পুত্রকে এক সিন্ধুকে বদ্ধ করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেন। সিন্ধুক ভাসিতে ভাসিতে রাক্ষসের দেশে উপনীত হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিশারদ এক রাক্ষস গণনা করিয়া দেখিল, শিশুর আয়ুঃ ১০০ বৎসর। এই শিশুকে রাক্ষস প্রতিপালন করিয়া তাহার সহিত তাহাদের পালিতা কন্যা জ্যোতিষে পণ্ডিতা খনার বিবাহ দেয়। মিহির গণনা করিয়া নিজের পূর্ব্ব বিবরণ অবগত হইলেন। এবং খনাকে লইয়া নিজ দেশে আসিলেন।

এইখানে পিতা পুত্রে পরিচয় হয়। বরাহ পুত্রবধূর গুণের পরিচয় জানিতেন না। এক-দিন এক কৃষক ধান্যবপনের দিন বিচারের জন্য বরাহের নিকট আগমন করে। বরাহ তখন বাড়ীতে ছিলেন না। খনা দাসীর দ্বারা কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কর্ত্তার

নিকট কেন আসিয়াছ ? কৃষক তাহার আগমনের কারণ বলিলে, খনা দাসীর দ্বারা তাহাকে জানাইলেন, অমুক দিন অমুক সময় তুমি ধান্য বপন করিও। কৃষক এই কথা শুনিয়াই প্রস্থান করিল। কৃষক চলিয়া যাইবার পথেই, বরাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহার নিকট সমুদয় কথা নিবেদন করিল। বরাহ গণনা করিয়া দেখিলেন, ঐ সময়ে ধান্য রোপন করিলে নিশ্চয় সোণা ফলিবে। বরাহ কিন্তু কৃষককে অন্যসময় ফসল করিতে উপদেশ দিয়া বাটিতে উপনীত হইলেন। ক্রমে খনার জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পারদর্শিতার সংবাদ দেশে প্রচার হইয়া পড়িল এবং ক্রমে স্বয়ং রাজা বিক্রমাদিত্যও ইহা শ্রবণ করিলেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য বিদূষী খনাকে নবরত্ন সভার অন্তর্ভুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ

করিলেন। শুনিয়া বরাহের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি ভাবিলেন, কুলবধূ রাজসভায় আসিলে দেশশুদ্ধ কি দুর্ণামই না রটনা হইবে। এই লজ্জা অপেক্ষা বধূর মৃত্যুই ভাল। বিশেষতঃ খনা রাজসভায় নিজ বিদ্যার পরিচয় দিলে বরাহ ও মিহিরের সুনাম অনেক কমিয়া যাইবে।

চিন্তা করিতে করিতে বরাহ গৃহে গিয়া পুত্রের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন এবং বধূর জিহ্বা কাটিয়া ফেলিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। মিহির পিতার আদেশ অনুসারে খনার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিলেন, ইহাতেই অভাগিনীর মৃত্যু হইল। পৃথিবী হইতে একটী অতুলনীয় রত্ন চিরদিনের জন্য অকালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

খনার মৃত্যু সংবাদ এবং বরাহের আচরণ অবগত হইয়া, মহারাজ বিক্রমাদিত্য বড়ই

দুঃখিত হইয়া বরাহকে ভৎ সনা করিলেন। মহারাজ কহিলেন,—"বরাহ! তুমি পণ্ডিত, তুমি এমন কুকার্য্যটা করিলে, একবার আমার উদ্দেশ্যটাও বুঝিলে না? আমি তাহার গুণের প্রচুর পুরস্কার দিতাম। রাজসভায় কুলবধূকে আনিয়া বসাইব, এতটুকু জ্ঞানও আমার নাই? নবরত্ন সভার রত্ন হইলেই যে তাহার মানসম্ভ্রম বজায় রহিবে না, একথা তুমি কোথায় শুনিলে? বরাহ পণ্ডিত! তুমি দেশের যে গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছ, তাহা আর বলিবার নয়। খনার মুখে জ্যোতিষের যে সরল তত্ত্ব প্রচারিত হইতে ছিল, তাহা যে অন্য কেহ কোনও কালে পারিবে, আমার ত এমন বিশ্বাস হয় না। হায় মিহির! পিতার আদেশ পালন করিবার সময় কি একবার নিজেও একটু চিন্তা করিলে না! দেশের দুর্ভাগ্য,

যে তোমরা ভ্রান্তিবশে এমন অমূল্যরত্নকে হেলায় অগাধ জলে ফেলিয়া দিলে।”

* * * * * *

নবরত্ন সভা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের দরবারে নানাশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। রাজা দেশ বিদেশের বহু পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বিচার করাইতেন। নবরত্নের পণ্ডিতগণও সময় সময় নানা স্থানে গমন করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। এইরূপে প্রায় সমুদয় ভারতবর্ষ সংস্কৃত চর্চ্চায় উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিল। রাজার বৃত্তি, পুরস্কার ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া, দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক রাজার সভায় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের স্থান হইল। নবরত্ন সভার সহিত প্রতিযোগীতায় সমান হইবার আশায়, বড় বড় পণ্ডিতগণ নানা

গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা করিতে লাগিলেন প্রত্যেক রাজা ও জমিদারের সভায় পণ্ডিত না রাখা অসম্মানের বিষয় হইয়া উঠিল।

রাজার সাহায্য পাইলে দেশের লোকের প্রতিভার বিকাশ হয়; মানুষ নিজ নিজ শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে পারে। কৃষকের যত্নে যেমন ক্ষেতে ভাল ফসল হয়, রাজার যত্নে দেশের কত লোক আপনার ক্ষমতা দেখাইয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারে। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মত রাজা না হইলে,হয়ত আজ নবরত্নের নামও কেহ শুনিত না, হয়ত কালিদাসের নামও জগদ্বিখ্যাত হইত না।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শক বিজয়।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য যে কেবল লেখাপড়া লইয়া, পণ্ডিত সমাজ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, আর কোন কার্য্য করিতেন না তাহা নহে বিক্রমাদিত্য স্বয়ং অসাধারণ যোদ্ধা ও রাজ-নীতিজ্ঞ ছিলেন। বড় বড় যোদ্ধা বিক্রমাদি-ত্যের নাম শুনিলে ভীত হইত। তাঁহার সৈন্যগণ সুশিক্ষিত ছিল। এই বিরাট সৈন্য-বাহিনী লইয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইলেন। পঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট প্রভৃতি দেশের রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ঐ ঐ রাজ্য আপনার অধিকারভুক্ত করিলেন।

বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্ব হইতেই এদেশে হূণ বা

শকজাতির উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল। ইহারা নিতান্ত অসভ্য ও বর্ব্বর। ইহাদের পরাক্রমও কম ছিল না। ইহারা অতর্কিত ভাবে সহসা গ্রামবাসীদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া যাইত। এই দুর্দ্দান্ত দস্যুদলের ভয়ে সকলেই ব্যতিব্যস্ত থাকিত। অথচ সম্মুখ যুদ্ধের জন্য কখনও ইহাদিগের দেখা পাওয়া যাইত না।

মহারাজ বিক্রম প্রজাকুলের আর্ত্তনাদ শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তাঁহার সেনাপতিগণ বহু চেষ্টা করিয়াও শকদিগের সন্ধান পাইলেন না। যে দিকে রাজসৈন্যগণ গমন করে, সে দিকে হূণেরা এক মুহূর্ত্তও অবস্থান করে না। তাহারা তখন অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে অন্য দিকে যাইয়া নগর গ্রাম লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়। রাজসৈন্যগণ বহু চেষ্টা করিয়াও এই দস্যুর

উপদ্রব দূর করিতে সমর্থ হইল না। প্রতিদিন কোনও না কোনও স্থান হইতে লোকের উপর অত্যাচারের সংবাদ আসিতে লাগিল। অগত্যা বিক্রমাদিত্য স্বয়ং যুদ্ধের জন্য সসৈন্যে প্রস্তুত হইলেন।

যাহার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার সহিত যুদ্ধ করা চলে; কিন্তু যাহাকে দেখা যায় না, যাহার খোঁজ খবর পর্যন্ত নাই, তাহার সহিত যুদ্ধ চলিতে পারে না। মহারাজ বিক্রম বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া এই দুর্দ্দান্ত দস্যুগণের আড্ডা এবং গতিবিধির সন্ধান লইলেন। অবশেষে এক বিশাল বাহিনী লইয়া চতুর্দ্দিক হইতে হূণদিগকে আক্রমণ করিলেন। সুশিক্ষিত সৈন্যগণের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অসভ্য হূণগণ বাতাহত কদলীতরুর মত ভূপতিত হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক শক যুদ্ধক্ষেত্রে



হইতে অরণ্যে পলায়ন করিল। বিক্রমাদিত্য সসৈন্যে ইহাদের পশ্চাতে চলিলেন। কোথাও ইহারা আশ্রয় লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল না। অরণ্যে বা পর্ব্বতে যেখানেই দস্যুদল একত্রিত হইত, সেইখানেই বিক্রমাদিত্য কালান্তক যমের মত উপনীত হইয়া ইহাদিগকে ধ্বংস করিতেন। বিক্রমাদিত্য শক নির্ম্মূল করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। বহু চেষ্টায় ইহাদের অধিকাংশ ধ্বংস করিলেন। যাহারা রহিল, তাহারা অত্যন্ত হীন ভাবে দূর পর্ব্বতে বা অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ভারতবর্ষ হইতে চির দিনের জন্য এই দুরন্ত শত্রুর বিভীষিকা দূর হইয়া গেল।

শক দমন করিয়া বিক্রমাদিত্য "শকারি" নামে পরিচিত হইলেন।

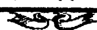
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সংবত।

বিক্রমাদিত্য শৈব বা শিবোপাসক ছিলেন। কিন্তু অন্যধর্ম্মের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তিনি সমুদয় ধর্ম্মেরই সম্মান করিতেন। যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে, তিনি সকলকেই উপযুক্ত সম্মান প্রদান করিতেন। প্রজাগণ স্বচ্ছন্দে আপন আপন ধর্ম্ম প্রতিপালন করিত। রাজা সকল প্রজাকে সমান ভাবে রক্ষণ করিতেন। এমন কি রাজার নবরত্ন সভার অন্যতম পণ্ডিত অমরসিংহ বৌদ্ধ ছিলেন।

তথাপিও মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব অনেক কমিয়া যায়। হিন্দুধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বত্র আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বিক্রমাদিত্য



মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের সময় হইতে এক সন প্রচলিত হয় তাহার নাম সংবত। এখন ১৯৭২ (বর্ত্তমান বাঙ্গালা ১৩২২ সাল) সংবত চলিতেছে। সুতরাং বোঝা যাইতেছে, ১৯৭২ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিয়াছিলেন। তবে বর্ত্তমান ঐতিহাসিক পণ্ডিত মহাশয়েরা বলেন, বিক্রমাদিত্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। তিনি শক জাতিকে পরাজিত করিয়া মালবাব্দকেই সংবত নাম প্রদান করেন। তাঁহারা বলেন,বিক্রমাদিত্যের আসল নাম—যশোধর্ম্মদেব।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য দেবতার অনুগ্রহে এক অত্যাশ্চর্য্য সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই সিংহাসন মণি মাণিক্যে খচিত ছিল। বত্রিশটী মনোহর পুতুলের উপর এই অপূর্ব্ব সিংহাসন স্থাপিত ছিল, এজন্য ইহার নাম "বত্রিশ

সিংহাসন”। বহুদর্শী পণ্ডিতগণ বলিতেন, বিক্রমাদিতের মত গুণবান ব্যক্তি ভিন্ন যে এই সিংহাসনে বসিবে তাহার বিশেষ অমঙ্গল হইবে। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর কেহই এই সিংহাসনে বসিতে সাহসী হইলেন না। তখন মন্ত্রীসমাজ পরামর্শ করিয়া এই সিংহাসন মাটীর নীচে পুতিয়া রাখিয়াছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রস্থান।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য একশত বৎসর জীবিত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠানপুরে শালিবাহন নামে এক রাজা ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের যশঃ এবং ক্ষমতার সংবাদ তিনি অবগত হইয়াছিলেন। বিক্রু-



মাদিত্যকে পরাস্ত করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় শালিবাহন বৃদ্ধ বিক্রমাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষে অগণিত সৈন্য উপস্থিত হইয়া কয়েকদিন যুদ্ধ করিল। বৃদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুবক শালিবাহনও তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। মালবরাজ্যের প্রজা ও সৈন্যগণ বৃদ্ধরাজার উৎসাহ দেখিয়া বিপুল উদ্যমে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

শেষদিন রাজা বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে শালিবাহনের সাক্ষাৎ হইল। দুই রাজা দুই ঘোড়ার উপরে ছিলেন। উভয়ের মাথায় মণিমণ্ডিত রাজচ্ছত্র ছিল। শরীররক্ষী সৈন্যগণে উভয় রাজার চতুর্দ্দিক বেষ্টিত। শালিবাহন দেখিলেন, উচ্চৈঃশ্রবার মত উচ্চ

সাদা ঘোড়ার পৃষ্ঠে শতবর্ষের বৃদ্ধ বিক্রমাদিত্য নবীন যুবকের মত বসিয়া আছেন। শরীরের চর্ম্ম লোল হইলেও, সেই বৃদ্ধের চক্ষে আজ কি উৎসাহ খেলা করিতেছিল। তাঁহার হাতে তরবারি খানি সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতে ছিল। সাদা চুলগুলির উপর রাজমুকুট অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। শালিবাহন মনে মনে কহিলেন, "হাঁ বীর বটে! একটী মানুষের মত মানুষ আজ দেখিলাম। এমন মানুষ দেখিলেও পুণ্য হয়। যথার্থই ইতি "বিক্রমাদিত্য"। যেন পিতামহ ভীষ্মদেব আজ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন।" শলি-বাহন মনে মনে মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে ভক্ত অভিবাদন করিলেন। এমন সময় বিক্রমাদিত্য সিংহবিক্রমে তাঁহার উপর আপতিত হইলেন। উভয়ের তুমুল



যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একজন অমিতবলশালী তরুণ যুবক; আর একজন অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের মত হীনপ্রভ ও ম্রিয়মান। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিতে করিতে হঠাৎ বিক্রমাদিত্যের হস্ত শিথিল হইয়া পড়িল, আর সেই মুহূর্ত্তে শালিবাহনের খড়গ তাঁহার বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইল। ভারতের রাজকুলের প্রদীপ্ত সূর্য্য মহারাজ বিক্রমাদিত্যের দেহ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ভূতলে পড়িয়া অস্ত গেল। কতিপয় সৈন্য তাঁহার রাজমুকুট লইবার জন্য অগ্রসর হইল। শালিবাহন গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "সাবধান, কেহ মহারাজার অঙ্গ স্পর্শ করিলে, এখনই আমি তাহার শিরশ্ছেদন করিব।"

ভারতের এক মূর্ত্তিমান যশঃ মহারাজ বিক্রমাদিত্য সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া,



স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। জগৎ জুড়িয়া তাঁহার অমর নাম বিরাজিত রহিল। যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, যতদিন মানব জাতি থাকিবে, ততদিন বিক্রমাদিত্য অমর। এমন যশস্বী রাজা পৃথিবীর ইতিহাসে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। একমাত্র "নবরত্ন সভা" মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

যুদ্ধের পরদিন উভয় পক্ষে সন্ধি হইল। বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার বিক্রম সেন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

উপসংহার।

বত্রিশ সিংহাসন সম্বন্ধে একটু কিছু বলিয়া এই গল্প শেষ করিব।

ধারা নগরীর ভোজরাজা একদিন শুনিলেন, রাজধানীর নিকটেই যজ্ঞদত্ত নামক এক কৃষক, শস্যরক্ষার জন্য ক্ষেত্রের মধ্যেএক মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই মঞ্চের মধ্যে বসিয়া সে পশু পক্ষী তাড়ায়। ঐ মঞ্চে বসিলেই যজ্ঞদত্তের বুদ্ধি ও মন্ত্রণাশক্তি অতি চমৎকার হইয়া যায়। তাহার সে সময়ের বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া প্রতিবেশী সকলে অবাক্।

রাজা এই সংবাদ শুনিয়া মন্ত্রী ও অন্যান্য

লোকজন লইয়া সেই স্থানে আসিলেন, এবং যজ্ঞদত্তের কার্য্যাদি লক্ষ্য করিলেন। তারপর ভোজরাজা যাহাকেই সেই মঞ্চে বসিতে বলেন, সকলেই তথায় বসিয়া চমৎকার বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগিল। কিন্তু মঞ্চ হইতে নামিলে, আর তাহার বিশেষত্ব কিছুই থাকে না। রাজা এই ঘটনা দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। তিনি ইহার নিগূঢ় কারণ জানিবার জন্য ঐ মঞ্চ ভাঙ্গিয়া, ঐ স্থান খনন করাইতে আরম্ভ করিলেন। সবিস্ময়ে সকলে দেখিলেন—মাটীর নীচে নানামণিরত্নবিভূষিত এক মনোহর সিংহাসন। তাহাতে রত্নময় বত্রিশটী পুত্তলিকা। রাজা ঐ সিংহাসন উঠাইয়া রাজধানীতে

লইয়া গেলেন এবং শুভদিন দেখিয়া রাজা ঐ সিংহাসনে বসিতে উদ্যত হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়—রাজা সিংহাসনে বসিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একটী পুত্তলিকা, মানুষের ভাষায় বলিল "এই সিংহাসন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের। তাঁহার মত সর্ব্বগুণযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন কেহ এই সিংহাসনে বসিতে পারে না।"

পুত্তলিকার মুখে এইকথা শুনিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা বিক্রমাদিত্যের কি কি গুণ ছিল?" পুত্তলিকা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের গুণ বর্ণনা করিল। ভোজরাজা যখনই সিংহাসনে বসিতে যাইতেন, তখনই এক একটী পুত্তলিকা বিক্রমাদিত্যের নূতন নূতন কাহিনী বর্ণনা করিত। এইভাবে

বত্রিশটী পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের মহিমা উল্লেখ করিলে, ভোজরাজা বুঝিতে পারিলেন, তিনি এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য নহেন। অতএব অতি সম্মানে ও যত্নে এই সিংহাসন কোনও স্থানে মৃত্তিকাগর্ভে গোপন করিয়া রাখিলেন। এই জগতে আর কেহ বত্রিশ সিংহাসনের সন্ধান পাইল না। সর্ব্বগুণযুক্ত বিক্রমাদিতের সর্ব্বরত্নময় বত্রিশ সিংহাসন লোপ হইয়া গেল।

সমাপ্ত